বেলালের আত্মস্বর

বেলালের আত্মস্বর

হজরত বেলাল রা. এর জীবনকাহিনি

সৈয়দ সালিম গিলানী

আবদুল্লাহিল বাকি
অনূদিত

নাশাত

বেলালের আত্মস্বর
হজরত বেলাল রা. এর জীবনকাহিনি
সৈয়দ সালিম গিলানী
আবদুল্লাহিল বাকি অনূদিত

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
বানানসংশোধন : আবদুল্লাহ মুহাম্মদ

মূল্য : ৩৩৫ (তিনশ পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

চিন্তার পথপ্রদর্শক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ
আদীব হুজুরের প্রতি...

অনুবাদকের কথা

আরবের যে প্রেক্ষাপটে ইসলামের উত্থান ঘটেছে—সে সময় কতৃত্বশীল দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল রোম, পারস্য আর আবিসিনিয়া। সে সময়ের আরব বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ থাকলেও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তা কিন্তু নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপরোক্ত তিনটি রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল আরবের।

ইসলামের সামাজিক প্রেক্ষাপটও এর অভিন্ন ছিল না। এজন্যই মুসলমানরা প্রথম হিজরত করেছে আবিসিনিয়ায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেতে হতো তাদেরকে শামে। আর শাম ছিল রোম সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ। আর ইয়েমেনের সাথে তো আরবের স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিলই। ইয়েমেন তখন পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আরবজাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত সাহাবিদের পাশাপাশি এই তিন অঞ্চল থেকেও আমরা প্রভাবদীপ্ত তিনজন সাহাবিকে দেখতে পাই ইসলামের ইতিহাসে। রোমদের পক্ষ থেকে সুহাইব রোমানি, পারস্য থেকে সালমান ফারসি আর আবিসিনিয়া থেকে বেলাল হাবশি।

সুহাইব রা. ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, ফর্সা। মাঝারি গড়নের উচ্চতা। তিনি আরবি পারতেন বটে, তবে তার উচ্চারণে রোমান ভাষার টান ছিল। কারণ তিনি শৈশব আর কৈশোর যাপন করেছেন রোমানের সংস্কৃতিতেই। পরে দাস হয়ে মক্কায় আসেন। শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেছেন ইস্পাহানের এক গ্রামে। সত্যের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পরে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আর বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করেছিলেন হাবশা থেকে। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে। তার মাতা হামামা ছিলেন একজন প্রাক্তন আবিসিনীয় রাজকুমারী। বিয়ের সময় তিনি আর স্বামী রাবাহ স্বাধীনই ছিলেন। কিন্তু আমুদ-ফিলের ঘটনার পর আবিসিনিয়া শাসক-শূন্যতার দরুন বহিঃআক্রমণের শিকার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দাসত্ব বরণ করতে হয় রাজকুমারীকে। তাই জন্মের সময় বেলাল দাস হয়েই জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গী। কিন্তু তার ছিল দীর্ঘ দেহ আর প্রশস্ত কাঁধ।

তারা তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম হিসেবে মাথা পেতে নিয়েছিলেন ইসলামকে। কিন্তু আরবসংস্কৃতি অপেক্ষা তাদের মাঝে বেশি ছিল দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব। আরবে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে তার প্রভাব যে পড়েনি, এমনটা অবশ্য

বলা যায় না।

যেমন, রোমানরা সাধারণত একটু বেশি অপচয় করে থাকে। এর নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক প্রভাব সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝেও ছিল। তিনি স্বাভাবিকভাবে ব্যয় করতেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। তা ছাড়া রোমানরা একটু ঠান্ডা মেজাজের আর রসিকপ্রকৃতির হয়ে থাকে। তার মাঝেও এই রসবোধ ছিল অন্যান্য সাহাবির চেয়ে বেশি।

আর পারস্য হলো অনেক আগে থেকেই—সবধরনের পির-মুরিদি, দরগাগিরি, মরমিবাদের লালনক্ষেত্র। এরকম অনেক খানকায় সালমান ফারসি ঘুরে এসেছেন। ইসলামগ্রহণের পরও তার মাঝে একটা মরমিবাদী মন সক্রিয় ছিল সবসময়।

আবিসিনিয়ার মানুষরা সাধারণত স্বচ্ছ হৃদয় আর ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকেন। বেলালও তেমন ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি স্বজাত হাবশিদের মতো দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু। উমাইয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তিনিও এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন বদরের ময়দানে। তির নিক্ষেপ করেছিলেন উমাইয়াকে লক্ষ করে। সে তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আমূল সেঁধিয়ে গিয়েছিল তার ভেতরে।

তারা কেউ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না আরবসংস্কৃতির। উঠে এসেছিলেন দাস হিসেবে অন্য মাটি থেকে। ইসলাম তাদেরকে মহত্ত্ব দান করেছে, আরবজাতীয়তা নয়। এজন্যই তারা আরব গোত্রবাদকে খুব ঘৃণার চোখে দেখতেন। কিন্তু আরবদের রগ-রেশায় সম্প্রদায়-প্রীতি মিশে গিয়েছিল। সামাজিকভাবে ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা ছিল ধীরে ধীরে এই ভূত আরবের মাটি থেকে বিদায় করা। আউস আর খাযরাজের এই গোত্রবাদী বিবাদ যেন নিষ্পত্তি হয়ে যায়—এই আবেদনেই ইয়াসরিববাসীরা প্রথম বাইয়াতুল আকাবায় এসেছিলেন। নবীজির কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগ্যই বলতে হয়। আব্বাসি খেলাফতের মতো একটি প্রভাবশালী খেলাফতের রাজধানী ছিল পারস্য; রোম বা আবিসিনিয়া নয়। বংশগত দিক থেকে আব্বাসিদের গর্বের প্রতীক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। কিন্তু জাতীয়তার প্রতীক ছিল পারস্যের মুসলমানদের কাছে সালমান ফারসি। তার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ও সংরক্ষণ করে তারা নিজেদের জাতীয়তার মর্যাদা রক্ষা করেছে।

কিন্তু বেলাল ও সুহাইব-এর প্রাক-ইসলামি জীবনের কিছু অংশ-মাত্র পাওয়া যায় ইতিহাসে। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এতটা বিস্তৃতভাবে তাদের প্রাক-ইসলামি জীবনধারা ও কর্ম আলোচিত হয়নি।

বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী সম্পর্কে লিখিত আদি উৎস হিসেবে আমরা দেখতে পাই হাদিস, আসার (বর্ণনা), সিয়ার (জীবনীমূলক পুস্তক ও বিশ্বকোষ), তারিখ (ঐতিহাসিক বর্ণনার সংকলন)। বিচ্ছিন্নভাবে এসব গ্রন্থে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবন আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছেন। একদিকে তিনি ছিলেন বহিরাগত আরব, কৃষ্ণবর্ণ দাস। অন্যদিকে ইসলামের জন্য নির্মম শাস্তির শিকার হয়েছেন কাফেরদের হাতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন। এতসব প্রাসঙ্গিকতার দরুন তাকে বিভিন্ন জীবনীতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাকে নিয়ে বর্তমানেও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হচ্ছে বাংলা, আরবি, উর্দু, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায়।

উর্দু ভাষায় রচিত সৈয়দ সালিম গিলানীর 'বেলাল' গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবন, রাসুলের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, অনুষঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে তারই মুখে, আত্মজৈবনিক স্বরে। যেন এটি কোনো আত্মকথা। এই পন্থায় জীবনী তুলে ধরার দরুন লেখক সেই যুগের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। রূপকথা, মিথ, বানোয়াট ঘটনার আশ্রয় না নিয়েও তিনি একে দিতে পেরেছেন ঔপন্যাসিক ভাষ্য—ঘটনার বিস্তৃতি, কথোপকথনের চমৎকারিত্ব ও বৈষয়িক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। তিনি যেই ঝরঝরে, স্বাদু গদ্যের প্রয়োগ করেছেন মূলগ্রন্থে, অনুবাদে সেটার একান্ত অনুকরণ ভিন্ন অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারিনি আমি।

বইটির অনুবাদ ছিল দীর্ঘ একটা প্রমোদভ্রমণের মতো। বিভিন্ন বাঁক ও পথ পাড়ি দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে এর। ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনাগুলোর অনুবাদ করার সময় মনে হচ্ছিল সেগুলোর একেকটি চিত্র ছায়াছবির পর্দার মতো জীবন্ত হয়ে উঠছে চোখের সামনে। কখনো ভেসে উঠছিল আনন্দের চিত্র, কখনোবা বেদনার। সেগুলোর প্রক্রিয়াগত প্রভাব পড়ছিল মনে। এর বাহ্যিক প্রকাশও এড়াবার শক্তি ছিল না আমার। ফলে কখনো চোখের কোণে জমেছিল বেদনার বিন্দুজল, কখনো ঠোঁটে ফুটেছিল আনন্দের উজ্জ্বলতা।

বইটাতে তথ্য ও বিষয়গত উপস্থাপনার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঘটনার পরম্পরা, পাঠ-উপযোগিতা ও বিশ্লেষণের উপর। তাই কিছু স্থানে পাঠকের ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে। সেসব স্থানে ব্যাখ্যামূলক ফুটনোট যুক্ত করে দিয়েছি। এতে বইয়ের মাহাত্ম্য খাটো হয় না, পূর্ণতা লাভ করে মাত্র।

বইয়ের রচনায় লেখকের ভাব যেমন উচ্চাঙ্গের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। লেখক সৈয়দ সালিম গিলানী একাধারে সুনিপুণ বাকশিল্পী, কবি ও ভক্ত। তার আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তার ভাব ও ভাষায় কাব্যের লালিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে ভক্তিপ্রবণ মুসলিম-অন্তরের মর্মকথা। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনাবিন্যাস বইটিকে নিয়ে গিয়েছে অনন্য উচ্চতায়।

বই, বইয়ের লেখক ও অনুবাদকের প্রয়াস আল্লাহ কবুল করুন।

ফিকশনের মোরাকাবায় বেলালের রুহ

আপনি রুশ সাহিত্যের একটা বিপ্লবী উপন্যাস তুলে নেন, যেখানে লেনিনের শাগরেদদের সরল জীবনের হাসি-কান্না, দেয়াল টপকানো আর সংগ্রামের কথা আছে। সরল ভাষায়। দেখবেন—আপনার চোখ ভরে উঠছে হঠাৎ পানিতে, গোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মনে জেগে উঠছে স্পন্দন। যতই আপনি দাগিয়ে দাগিয়ে আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের আফয়ুনুশ শু'উব বা আবদুল্লাহ আজ্জামের লাল কর্কট পড়েন, যতই মার্কসবাদের খুনোখুনি সম্পর্কে শোনেন, বা মানুষের উদ্ভব-বিষয়ক তাদের তত্ত্বের ভুলের যত গভীর দুর্বলতার কথাই জানেন না কেন—তাদের কোনো এক গ্রীষ্মকালীন বক্তৃতা বা অক্টোবরের জেলখানার ক্ষুধা আপনার হৃদয় স্পর্শ করবে। সেইসব উপন্যাস আপনার জীবনের বোধ যেমন করে নাড়িয়ে দেবে তার সিকিভাগও পারবে না জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে'র শেষ বাক্য—তার বিনির্মিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপট। কারণ মার্কসীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে একটা বিশ্বাসের উপর, একটা আকুতি উপর, একটা সংগ্রামের ব্যর্থ ইতিহাসের নাম পতাকার উপর।

মানুষের কাছে—মানে আসলেই যারা মানুষের কাতারে উন্নীত—তাদের কাছে রক্তের চাইতেও মূল্যবান থাকে আপন বিশ্বাস ও ধর্ম। আরবিতে আছে, বিশ্বাস তাকেই বলে, যার শেষরক্ষা করতে গিয়ে মানুষ জাস্ট মরে যায়—যেন তার মৃত্যু সেই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার একটা অদৃশ্য খুঁটি হয়ে আজন্মকাল দাঁড়িয়ে থাকে। তাই বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত জীবন ও তাদের মাটির গল্প শুনলে অন্তর জেগে ওঠে; সেটা যে ধর্মেরই হোক। দ্য পিয়ানিস্ট বা লাইফ ইজ বিউটিফুলে নাৎসিদের হাতে ইহুদিদের জীবন দেখে আমাদের চোখে যেমন পানি আসে একই রকম উত্তাপ আসে বাইবেলের Love the Lord your God with all your heart and with all your soul—এর অন্তর্নিহিত মর্মের স্পর্শে। সেই চিত্রটা নির্যাতন বা দুঃখের হওয়া জরুরি না; আপনি এমনিতেই কাঁদবেন একা একা থাকলে।

পৃথিবীতে ইসলাম এসেছিল হাজার বছর আগে পরম এক বিশ্বাসের শরবত নিয়ে—যারাই তা পান করেছে তারাই হয়ে গেছে কালের সুলেমান। তারা আমাদের মতো পয়দাগত ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে হাজির হননি। প্রত্যেককে চরম মূল্য দিতে হয়েছে নিজের বিশ্বাসের বিনিময়ে। তাদের সবাইকে নিয়েই একদিন রচিত হয়েছিল একটা সোনালি হিস্ট্রি, একটা পবিত্র বিস্তৃত দেয়ালচিত্র—যেগুলোকে অনুসরণ করার মিথ্যা নাম দিয়ে আমরা প্রত্যহ জীবনের দুঃখ ঘাটছি।

তাদের জীবনে নির্মম কষ্ট ছিল, তবে দুঃখ ছিল না। সেইসব কথাবার্তা নিয়ে অতীতেই গ্রন্থিত হয়েছে ইতিহাসের কোটি অক্ষর। মোটা মোটা কিতাব। যেখানে

নবীর ঘটনা—তার চারপাশের মাটি ও মানুষের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 'উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে'। নিখাদ পরিশুদ্ধ তথ্যময় ইতিহাস ছিল সেগুলো।

অনেকে অনেকভাবে রচনা করছে তাদের কথা। সুন্দর ভাষায়, ফাউল ভাষায়, আবেগের ভাষায় বা তাত্ত্বিক ভাষায়। শৈশবে আমাদের বাসায় সাহাবিদের অনেক জীবনী ছিল। আব্বু পড়ত আর ঝরঝর করে কাঁদত—আমার মনে আছে, অফিস থেকে এসে প্রায়ই আমাদের শোনাত সেই পাতা-ফুলহীন মরুজীবনের বিকেলের কথা। গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী খুলে আমি বসে থাকতাম অনেক। তিনি শান্ত নিঃশ্বাসে বর্ণনা দিতে থাকতেন তায়েফের দুঃখ অথবা নবীজির। বায়তুল মোকাররম থেকে ২০০৬-এর দিকে আব্বু কিনে নিয়ে এসেছিলেন আসহাবে রাসুলের জীবনকথার হয় খণ্ড। সেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের যুদ্ধ-জীবনের গল্প পড়ছিলাম—রিডিং শেখার পর। পুরো শৈশবটা ভরে আছে আব্বুর আবেগঘন সাহাবা-জীবনের চিত্রায়ণের স্মৃতিতে। তার হু হু করে কেঁদে ওঠার বিমূর্ত স্মরণের আবেশে। কোনোদিন ভোলা যাবে কিনা সেসব হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা—জানি না। আমি অথবা ভাইয়া—সেই সংমিশ্রিত আধ্যাত্মিক সুত্রের হোটবেলা নিয়ে বেঁচে থাকব মৃত্যু পর্যন্ত।

সম্প্রতি নাশাত পাবলিকেশন থেকে ভাইয়ার অনূদিত 'বেলালের আত্মস্বর' বইটি বের হচ্ছে অপরূপ প্রচ্ছদে। প্রথমে যখন ভাইয়া অনুবাদটা নিয়েছিল আমি বলেছিলাম—ভালো কোনো বই নিতা! প্রতিউত্তরে কিছু বলেনি ভাইয়া। দীর্ঘদিন গত হয়েছে সেই সময়ের পর। ভাইয়াকে আহসান ইলিয়াস ভাই একদিন জানালেন, বইটি যেহেতু প্রকাশ পাচ্ছে শেষবার একটু দেখে দিন। ভাইয়া ফেলে রাখল নিজের বইয়ের শিটগুলো বাসায়। আমি নিয়ে এলাম একদিন সেগুলো মাদরাসায়। পড়লাম আর বারবার ঝাপসা হতে থাকল আমার চোখ। অত্যুক্তি মনে হলেও সত্যি—বই পড়ে কাঁদার মানুষ আমি না; তবু শিশিরের মতো কান্না জমল চোখে।

এখানে বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে যদিও বেলালের জীবন—তবে এটা শুধু বেলালের জীবন না। মুসার আন্দোলনের বিশ্লেষণ ও ঘটনাপ্রবাহের চিত্র যেমন 'উত্তম পুরুষের' তুলিতে আঁকা যায়, তেমনি লেখা যায় ইউশার কণ্ঠে বা হারুনের আত্মস্বরে।

একইভাবে ইসলামের উত্থান-পতন–দুঃখ–আনন্দ–বিজয় বা রক্তাক্ত সন্ধ্যার কথা এখানে আবৃত্তি করানো হয়েছে বেলালের জবানে, তার আজানের গন্ধবহ কণ্ঠে। আত্মজৈবনিক সুত্রে।

মুসলিমসভ্যতার দুটি গ্রেট সিলসিলার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে বেলালের জীবনে—এক ফ্রিডম বা স্বাধীনতার প্রেরণা, দুই রেসিজম বা কালো মানুষকে ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসার শিক্ষা। এই দিক থেকে বেলাল একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র, ইসলামের আরবীয় পটভূমে। তার অনুভূতির মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাসের আলোচনা বিশ্বাসের গভীর আগুনে বাঙময় হয়ে উঠেছে এই বইয়ে বারবার। বদর ওহুদ আকাবা

বা মক্কা-মদিনার জীবন শুধু নবীর একার নির্দিষ্ট গল্প না; তাদের প্রত্যেকের গল্প সেই একটাই ছিল। তারা সকলে মিলেই একদিন বিনির্মাণ করেছিল অ্যারাবেস্কে ভরা এক মহিমান্বিত জায়নামাজ—যেটা আজকের পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় যুগান্তরের মার খাওয়ার রক্ত নিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

হলিউড থেকে বেলালের জীবনের উপর একটা এনিমেশন নির্মিত হয়েছে ইংলিশে। সেইটার ট্রেইলার যখন ফেসবুকে ছাড়া হয়েছিল, এক ইংরেজ কমেন্টে বলেছিল—ইসলাম বাস্তবিকতার ধর্ম, ফিকশনের না। কয়েকটা দীনি বোন তার সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছিল। তবে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—এনিমেশনে যেই বেলালকে দেখানো হয়েছে যে—Bilal lives a peaceful life with his mother and his younger sister in the outskirt of the village until the Byzantine soldiers come, enslave them and kill his mother. And one day she said Bilal—you have to be a great soldier in your future!—এটা বাস্তবের বেলালের কাহিনি না। ইসলামকে মানুষের কাছে লোভনীয় করার জন্য আলাদা করে ইমোশনের মিথ্যা ক্ষেত্র তৈয়ার করার দরকার নেই, যৌক্তিকভাবে বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে এর যেই মাধুর্য আছে, তা তুলে ধরাই যথেষ্ট—মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

এই ক্ষেত্রে 'বেলালের আত্মস্বর' সফল। উপন্যাসের নাম করে একটাও মিথ্যা প্রেমকাহিনি বানানো হয়নি এখানে। বানোয়াট কেচ্ছাও তুলে ধরা হয়নি।

যত খারাপ মানুষই হোক—আত্মজীবনের বয়ানে তাদের নিঃশ্বাস আদিম অনুভূতি ও স্মৃতির শান্ত রোমন্থনের সুরে ভরে ওঠে। যখন তারা অতীতের কথা বলে, প্রকাশ করা যায় না এমন এক নস্টালজিক ঘ্রাণ টান দিয়ে নিয়ে যায় কবরের দিকে—তারা মরে গেছে বহু বহুকাল আগে। শামসুর রাহমানের কালের ধুলোয় লেখা, সৈয়দ আলী আহসানের জীবনের শিলান্যাস, নেলসন ম্যান্ডেলার লং ওয়াক টু ফ্রিডম, বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর রিসালাতুন ইশাশ শুমুখ, আহমদ আমিনের হায়াতি, বা টাইটানিকের বৃদ্ধ মহিলাটির নিষ্প্রভ দৃষ্টির স্মৃতিচারণের কোলে শিল্পের যেই রূপ অঙ্কিত হয়েছে—তার সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা চলে না দুনিয়ার।

একইভাবে বেলাল যখন দামেশকের মাটিতে বসে সুদূর অতীতে ফেলে আসা জীবনের সুন্দর সময়গুলোর বর্ণনা দিতে থাকে সরল মাধুর্যে সহজ মানুষের মতো—ভেতরে জেগে ওঠে কান্না।

এটা পড়ার আগ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল—প্রথম কাজটা বাজে বই দিয়ে শুরু হলো ভাইয়ার। এখন মনে হচ্ছে—এটাই হওয়া দরকার ছিল প্রথম।

এটা উপন্যাস না, আত্মকথা; যেখানে একটা আন্দোলনের উত্থান-পতনের বহু প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা হয়েছে—কখনো আবেগে, কখনো দার্শনিক বিশ্লেষণে। সেগুলো পড়ে দেখা জরুরি।

বইটির মধ্যে টেনে ধরে রাখার একটা ক্ষমতা আছে। কয়েকদিন আগে অনেক প্রস্তুতি নিয়ে রাহীকুল মাখতুম পড়েছিলাম—বইয়ের সাথে জোর করে নিজেকে বেঁধে। মহৎ বই মানেই টেনে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। তবে এটা না থাকাও কোনো অপরাধ না।

আখের, বইটি আমার ভালো লেগেছে।

আবদুর রহমান রাফি
মিশকাত, আকবর কমপ্লেক্স

সূচিপত্র

আমি বেলাল বলছি : ১৭
কাবার আঙিনার দিনরাত : ১৯
ব্যথার সাথি : ২৪
দাসত্বের কালো দাগ : ২৯
শেষরাত, প্রথম দিন : ৩৬
মহা উপঢৌকন : ৪০
শান্তির পরিসমাপ্তি : ৪৩
মহানবীর দরবারে : ৪৭
স্বাধীনতার পাঠ : ৫৪
নবী-জীবনের গল্প : ৫৯
অনন্ত সুখের দাম্পত্য : ৬৮
প্রথম ঐশীবাণী : ৭১
মহাগ্রন্থ কোরআনের অবতরণ : ৭৫
পলায়নপরতার হেতু : ৮০
বিপ্লবের সূচনা : ৮৬
আমার মোনাজাতের শব্দমালা : ৯১
প্রথম হিজরতযাত্রা : ৯৩
নাজাশির দরবারে : ৯৭
সামাজিক বয়কট : ১০৪
হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু : ১০৭
উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু : ১১১
আবু জেহেল : ১১৭
বিপদ-আপদের ধারাবাহিকতা : ১২৪
আবু বকরের উপর বিপদ-আপদ : ১২৮
মন্দ একটি দিন : ১৩০
আকাবার প্রান্তরে : ১৩৩
জ্যোতির্ময় মদিনা : ১৩৮
বিদায় সালাম মক্কা! : ১৪১
সাওর গুহা থেকে কুবা মসজিদ : ১৪৫
কুবানগরী : ১৪৯

বাতহার প্রান্তরে : ১৫৫
মসজিদ বিনির্মাণ : ১৫৯
অনুপম ভ্রাতৃত্ব : ১৬২
আজানের প্রথম ধ্বনি : ১৬৬
ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় : ১৭২
বদরের যুদ্ধ : ১৭৬
ওহুদের যুদ্ধ : ১৮১
ওহুদের সন্ধ্যে : ১৮৫
ইহুদিদের উৎখাত : ১৯০
পুনরায় বদরের প্রান্তরে : ১৯৬
খন্দকের যুদ্ধে : ১৯৯
হুদায়বিদার যাত্রা : ২১২
সুস্পষ্ট বিজয় : ২২০
আপন ঘরের পাশে : ২২৬
আবু সুফিয়ান : ২৩১
মক্কাবিজয় : ২৩২
মক্কাবিজয়ের আজান : ২৩৮
আরাফায় ভাষণ : ২৪৩
দাসত্ব : ২৪৫
বন্ধক রয়ে গেলাম : ১৫৪
ইসলামের প্রচার : ২৫৯
নবীশূন্য পৃথিবী : ২৬১
শেষআজান : ২৬৬
বিদায় : ২৬৭

আমি বেলাল বলছি

আমি বেলাল। গায়ের বরণ কালো। আবিসিনিয়ার এক নিগ্রো দাস রাবাহের ঘরে আমার জন্ম। দাসের ছেলে হিসেবে জন্ম থেকেই আমি দাস। দাসত্বের মাঝেই আমার চোখের আলো ফুটেছে। বেড়ে উঠেছি গোলামির শৃঙ্খল পায়ে জড়িয়ে। এই গোলামির মধ্য দিয়েই স্পর্শ করেছি যৌবন। দাস হিসেবে আমার বেচাকেনা হয়েছে বারবার...

এভাবেই হয়তো একদিন গোলামির দাগ বুকে নিয়ে, চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়ে, পরিচয়হীন আমার নিষ্প্রাণ দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত ধুলোবালির স্তূপে। কিন্তু...

একদিন মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী উমাইয়া আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এরপর শুধুই ইতিহাস...

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এখন আমি দিনকাল যাপন করছি দামেশকে। অতীত স্মৃতির দিগন্তে উমাইয়া একটা অস্পষ্ট কালো দাগের মতো সুদূরপরাহত। একটা সময় ছিল—যখন এই কালো দাগ আমার জীবনের সকল আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আঁধারের পর্দা দীর্ণ করে বেরিয়ে আসার মতো আলোর ছিটেফোঁটাও ছিল না।

কালো অন্ধকার মেঘের মতো—কখনো সে ছড়িয়ে পড়ত। অথবা জমাটবদ্ধ শিলাদৃঢ় হয়ে উঠত। তীব্র পাথর বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো কখনো।

তবে ছিন্ন হতো না কখনোই গোলামির দুর্ভেদ্য প্রাচীর...

আমার আকাশে তার কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র জগৎ—চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসত। জমাটবদ্ধ হলে বিশাল শিলাবৃষ্টির মতো আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত। তার বজ্রধ্বনি গর্জে উঠলে নরকের কালো বৃষ্টির মতো চারদিক ফেটে পড়ত। বর্ষণ করলে তার চাবুকের আঘাতে বিশ্ব চরাচরের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। এ থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ ছিল না...

দাসদের জীবনে কোনো চড়াই-উতরাই নেই। বৈচিত্র্য নেই ঘটনার। সন্ধ্যা কেটে যায়, সকাল আসে। তাদের জীবনে সময়ের ধারা বয়ে যায় এভাবেই।

কিন্তু তাদের কারো জীবনে একবার যদি ট্রাজেডি নেমে আসে, তাহলেই সে নিঃশেষ ও নিস্তব্ধ হয়ে যায় চিরকালের জন্য। অন্য বিয়োগান্তক নাটকের জন্য তার জীবনে আর কোনো স্থান থাকে না।

তারা যদি কখনো লুটিয়ে পড়ে, তাহলে ওঠার সুযোগ থাকে না আর। জীবন একবার ভেঙে গেলে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগা হয়ে পড়ে সাধ্যের অতীত।

গোলামের জীবনধারা তাহলে কেমন? তাদের জীবন চাবুকের জন্য উৎসর্গিত নিথর দেহ ছাড়া কিছুই নয়। যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে, যেকোনো কথার মুখে তাদের দেহে হতে পারে চাবুকের অবিরাম বর্ষণ।

উমাইয়া ছিল গর্বিত, আত্ম অহংকারী। ধনদৌলত, বংশগৌরবের অহংকারে অন্যদের সে নিজের অনুগত মনে করত।

আমার ব্যাপারে শুধু তার এতটুকুই জানা যথেষ্ট ছিল—আমি বেলাল, তার টাকায় কেনা গোলাম। এটুকুই। তার ব্যাপারেও আমার এতটুকু জানা যথেষ্ট ছিল—সে আমার মালিক। আমার মনিব।

মালিকের আনন্দ-ক্রোধ শুধু মালিকই জানতেন। গোলামের কোনো অধিকার ছিল না এসব জানার। জরুরিও ছিল না। কোনো প্রশ্ন অথবা কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করারও ছিল না কোনো অনুমতি।

তার একমাত্র কাজ—পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক ঠিক কাজ আঞ্জাম দেওয়া। সঠিক হলে তার ভাগ্য ভালো। আর নয়তো তার কপালে থাকত ভিন্নকিছু।

আজ যে দুনিয়ায় বেঁচে নেই, তার সম্পর্কে কোনো অযাচিত কথা বলতে চাই না। তবে এতটুকু বলতে পারি, উমাইয়া মক্কার বাজার থেকে আমাকে খরিদ করার সময়, দাম আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো লুকোচুরি করেনি। পাই পাই করে গুনে আমার মূল্য চুকিয়ে দিয়েছে। আমিও কোনোদিন তার কোনো ক্ষতি করিনি।

উমাইয়ার অনেক কথাই আজ স্মৃতির ঝাঁপিতে জেগে আছে। ভুলতে চেষ্টা করেও কখনো পারিনি ভুলতে।

আমি বেলাল। ছিলাম উমাইয়ার টাকায় কেনা এক গোলাম। সেই কুয়াশাঘন দিনগুলোর গল্প আপনাদের শোনাতে চাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত... এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতায় ভরা এই জীবন—নিখাঁদ করুণ বাস্তবতার দুঃখাশ্রিত উচ্চারণ।

সেই দিনগুলোর নেশা আজ অবধি আমাকে মাতাল করে রেখেছে। আমার মতো গোলাম প্রায় বাইশ বছর সেই মাটিতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে, যাকে আমোদিত করে রেখেছে আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বাস-প্রশ্বাসের ঘ্রাণ।

তিনি যা বলেছেন—আমি শ্রবণ করেছি। যা করেছেন—দু' চোখ দিয়ে দেখে দেখে ধন্য হয়েছি।

কাবার আঙিনার দিনরাত

গ্রীষ্মকালের এক সকাল। অভ্যেসমতো উমাইয়া ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর জন্য বেরিয়ে গেছে। তখন ব্যবসায়ীদের জলসা বসত কাবার চত্বরে সামিয়ানার ছায়ায়। এমন সকালগুলো আমার বেশ ভালো লাগত। ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের ক্রীতদাসরাও থাকত। খানিক দূরে বসে অপেক্ষা করত তারা আপন মালিকদের ইশারার।

এই সময় গোলামদের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কানাঘুষা চলত। শোনা হতো অথবা বলা হতো সত্য মিথ্যা বিভিন্ন খবর। সময়টাও বেশ ভালো কাটত।

সেই জলসায় আমাদের জন্য সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল—গোলাম হবার পরও ছায়ায় বসার পরম সৌভাগ্য লাভ। বলতে গেলে, মক্কার মতো রুক্ষ উষ্ণ অঞ্চলে এই ছায়া ছিল এক বিশাল নেয়ামত। আর সেই ছায়ার নিচে আমাদের মতো গোলামদের অনুভূতি ছিল, যেন এটা আবদ্ধ কারাগারের মধ্যে শ্বাস নেওয়ার মতো শীতল সজীব একগুচ্ছ হাওয়ার ঝাপটা।

মক্কার মরুময় রুক্ষ ভূমিতে কোনো ফসলই ফলত না। ফুলফল, গাছ-ঘাস, গুল্ম-লতা, সবুজ শ্যামল শস্য চোখে পড়ত না কোথাও। দিনের সূর্যের তাপে চারিদিকের পাহাড় থেকে তাম্বুর মতো উষ্ণ ভাঁপ উঠত। মক্কার পাষাণ বুকে সন্ধ্যে নেমে আসার আগ পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকত অদৃশ্য অগ্নি-বৃষ্টি।

তারপরও যেন এই শহরে লুকিয়ে ছিল এক অজানা জাদু—সম্মোহন। ম্যাগনেটিক পাথরের মতো চুম্বকাকর্ষণে যেন সে স্বদেশবাসী মানুষের অন্তরগুলো বেঁধে রাখত নিজের সাথে। এজন্যই মক্কার বাইরে কেউ গেলেও মক্কায় ফিরে আসার জন্য মন আনচান করত। এলোমেলো হয়ে যেত উদাস ভাবনারা। যতটা দ্রুত সম্ভব— প্রয়োজনের কাজকারবার শেষে মানুষেরা আবার মক্কার পথ ধরত। মক্কার নাম শুনলে উটগুলোর কান পর্যন্ত খাড়া হয়ে যেত। গতি বাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসত মক্কার দিকে।

আমি ছিলাম নিছক এক ক্রীতদাস। মক্কায় লাঞ্ছনা আর অপদস্থতা ছাড়া নিজের করে আর কিছুই পাইনি। জন্মের পর থেকেই আমার এক ভাগ্য—কখনো মানুষের বোঝা বইতে হয়েছে, কখনো পাহারাদারি, কখনো নিদারুণ কষ্টের কাজকর্ম। যেন বুঝতে চাচ্ছিলাম, রক্ত-ঘামের কতটুকু বিসর্জন আমি সইতে পারি।

নিদারুণ কষ্টেও কেন যেন আমার কোনো বেদনা ছিল না। জীবনে এক ধরনের শান্তির পেলবতা বিরাজমান ছিল।

এখন আমার সামনে দামেশকের সুপেয় শীতল পানি। কিন্তু আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, মক্কার সেই রুক্ষ মরুময় এলাকার পবিত্র জমজমের কয়েক আঁজলা পানির সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না।

মক্কার পাথুরে মাটি ফুঁড়ে ঝরনার মতো নির্গত হতো যমযমের পবিত্র জল। আমার মতো গোলাম ক্লান্তিহীন পান করে যেত সেই অমিয় সুধা।

এমনটা কেন হতো? মক্কার আঙিনায় কি কোনো জাদুর পরশ ছিল?

শস্যহীন বিরানভূমি। সূর্যের তীব্রতায় কাঁপতে থাকা নগরী। নেই কোনো গাছপালা, সবুজ শ্যামল। নেই কোনো পাখি পতঙ্গ প্রজাপতি। প্রকৃতির নান্দনিক দৃষ্টি থেকে বিমুক্ত এ নগরী।

তবু কেন বসবাসকারীদের অন্তর এই ভূমিতে পড়ে থাকত? হৃদস্পন্দনের সঙ্গে কেন এক হয়ে যেত এই মরুভূমির ভালোবাসা?

এর একমাত্র কারণ হলো—জগতের সুরমার সৌন্দর্যে কালো চাদরাবৃত আল্লাহর ঘর কাবা। যার মধ্যে আছে উর্ধ্ব আকাশ থেকে নেমে আসা এক রত্ন।

এর মাঝে এখানে শতশত খেজুর-বীথিকার ছায়া। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুরের উৎপাদন হয় এই ভূমির ক্রোড়েই। বর্বরতা ও জাহেলিয়াতের যুগেও হেরেম শরিফ ছিল নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভয়নগর। কোষবদ্ধ তরবারি কারো বিরুদ্ধে উন্মুক্ত করা এখানে বৈধ ছিল না। শত্রুর বিরুদ্ধে হাত তোলা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ— কোনো কিছুরই একদণ্ড সুযোগ ছিল না কাবা শরিফের সীমানার ভিতর।

কাবা শরিফ মহান আল্লাহর ঘর। নির্মিত হয়েছিল ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পবিত্র হাতের ছোঁয়ায়। শুধু এক আল্লাহর ইবাদত ও উপাসনার জন্য।

কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের মনে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা জাগতে থাকে। এরই ফলে এই মহান ইবাদতখানা, লাকড়ি পাথর ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত মূর্তি ভাস্কর্যের গুদামঘরে পরিণত হয়। এসব মূর্তির জন্য আরবদের মনে ছিল ঐশ্বরিক অবস্থান।

প্রথমে ধীরে ধীরে তাদের মন থেকে সর্বশক্তিমান মহাপ্রজ্ঞাবান এক আল্লাহর বিশ্বাস উঠে যেতে থাকে। তাদের বিশ্বাসের নিরুপদ্রপ ভূমি দখল করে নেয় এই প্রাণহীন মূর্তিগুলো। একটিমাত্র ঈশ্বর নয়, পার্থিব জীবনের লোভ-লালসার শিকার হয়ে শত শত ঈশ্বর বানিয়ে নেয় তারা। ঈশ্বর ছিল তাদের তিনশ ষাটটি।

মজার ব্যাপার হলো, এসব ঈশ্বরকে নিয়ে খুবই জমজমাট হয়ে উঠেছিল তাদের মূর্তি-বাণিজ্য। মূর্তি বানিয়ে বানিয়ে মূল্যের বিনিময়ে ধনী লোকদের কাছে বিকোনো হতো। তারাও খরিদ করে নিয়ে যেত মহানন্দে।

তাদের মধ্যে কেউ ছিল দিবসের ঈশ্বর। কেউবা আবার রজনীর। কেউ ছিল সুস্থদের ঈশ্বর, কেউ আবার রোগীর। উত্তম ভাগ্যের জন্য এক ঈশ্বর, কপাল পোড়ার জন্য আরেকটি। প্রবাসে এক ঈশ্বর, নিবাসে আরেক।

তাদের সব ঈশ্বরই ছিল পার্থিব জীবনের একেকটি চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য। পরকালীন জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করার জন্য কোনো ঈশ্বর গ্রহণ করার সদিচ্ছা তাদের কখনোই জাগেনি।

কাবা শরিফের পাশ দিয়ে যেসব কাফেলা আগমন ও নির্গমন করত, মূর্তি বিকিয়ে তাদের কাছ থেকে কীভাবে টাকাপয়সা হাতানো যায়—এই ধান্দাই তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল; বাজার অথবা মন্দিরে যেমনটা দেখা যায়।

প্রতিবছর নির্দিষ্ট এক মাসে আরবের সকল গোত্র মাইলের পর মাইল সফর করে বিভিন্ন মূর্তির পদতলে অর্চনা দিতে আসত। তখন চারিদিকে ঝলমল রংবেরঙের আড়ং ও বেসাতি বসত। মেলা বসাত শাম-ইয়েমেন-পারস্যসহ অন্যান্য দূরদূরান্তের বণিকরা। সোনা-চান্দি, আতর-জামা সবকিছুরই জমে উঠত রমরমা ব্যবসা। বিক্রি হতো পাশাপাশি দাস-দাসি এবং তিনশ ষাট ঈশ্বর।

"দেখো দেখো, ও নাকি খোদার সাথে বাতচিত করে।"— আবু জেহেলের আকস্মিক এই কণ্ঠ গোলামদের খানিকটা চমকে দিল। আবু জেহেলের গোলাম বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। আওয়াজ পাওয়া মাত্রই ঘোলা ঘোলা চোখ নিয়ে এক ঝাঁকুনিতে দাঁড়িয়ে গেল। কাণ্ডখানা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আবু জেহেল। মাথা নিচু করে গোলাম বসে পড়ে।

"পয়গাম্বর সাহেব, স্রোতবাহী পানির উপর দিয়ে আমাদের একটু হেঁটে দেখান তো। আপনার নবুয়তের সত্যতা দেখি।"— এটা ছিল উমাইয়ার তাচ্ছিল্যভরা বিদ্রুপ।

উমাইয়া কী বলতে চাচ্ছে তা প্রথমে বুঝতে না পেরে ঝটপট করে আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম।

আহা কপালপোড়া আমার মালিক! আজ জাহান্নামে বসে বসে যথোচিত উত্তর পাচ্ছে সেই বিদ্রুপভরা প্রতিটি বাক্যের।

আমি দেখতে পেলাম তাকে। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহকে। একা নিঃসঙ্গ তিনি। দৃষ্টি পাহাড়ের উচ্চতায় প্রসারিত। লোকে বলে—এক ফেরেশতার সাথে নাকি তার কথাবার্তা হয় মাঝেমধ্যে।

আবু জেহেলের বিদ্রুপের দিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। কাবার চারিদিকে চক্কর দিতে দিতে একবার শুধু আবু জেহেল সামনে পড়ে গিয়েছিল। বণিকদল তখন হেসে গড়িয়ে পড়ছিল আবু জেহেল আর উমাইয়ার চুটকিতে। সবাই একসাথে ফুর্তিতে অংশ নিচ্ছিল।

একমাত্র আবু সুফিয়ান ব্যতিক্রম। চেহারার বালিয়াড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। তাকে মক্কার গোলামরা কীভাবে দেখত—সেটা একটু বলে নিই।

আমাদের মতো গোলামরা প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিত আপন মালিককে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়ার উপযুক্ত মনে করত—সে ছিল আবু সুফিয়ান। শিকার ও শিকারির মাঝে যে সম্পর্কটা থাকে—আমাদের মতো ক্রীতদাসদের সাথে আবু সুফিয়ানের বোঝাপড়াটা ছিল তেমনি।

হঠাৎ করে সে দাঁড়িয়ে গেল। জলসার স্বাভাবিকত্ব ভেঙে সে জোর গলায় বলতে লাগল—"এক খোদা মানা খোদাকে অস্বীকার করার নামান্তর।"

নিজেদের শিরায় হাত রেখেই কথাটা বলতে পেরেছে আবু সুফিয়ান। কারণ এক উপাস্যের আহ্বান কানে তোলা কাফেরদের জন্য ছিল সবচেয়ে অসহ্যকর। নিজেদের বিশ্বাসমতো তৈরি করে নিয়েছিল তারা কিছু ঈশ্বর। একক উপাস্যের ধারণা ছিল তাদের গণ্ডিবহির্ভূত। আবু সুফিয়ান আপন ঘরানায় চিন্তাশীল হিসেবে বিবেচিত ছিল। সে পুনরায় মুখ খুলল : "গজিয়ে ওঠা এই অধর্ম এখনই যদি মূলোৎপাটন করা না হয়, তাহলে প্রভু আমাদের উপর নাখোশ হয়ে এই ভূমি থেকে বরকত উঠিয়ে নেবেন। পাঠিয়ে দেবেন অন্য কোনো স্থানে।"

আবু জেহেল এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিল। সে মুখ খুলল : "আবু লাহাব, তুমি তো এর চাচা। আত্মীয়তার দাবি থেকে বলছি—যতদ্রুত সম্ভব নিজের ভাতিজাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনো।"

আবু লাহাব আঁতকে উঠলো। এতদিন স্বেচ্ছায় এসব আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। অংশগ্রহণ করতে চায়নি কখনোই। সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল : "সঠিক পথে আনব? কিন্তু কাকে? মুহাম্মদকে? সে কি কোনো শিশু? সে তো চল্লিশ বছরের এক বুঝসম্পন্ন লোক। কোনো সন্দেহ নেই—সে আমার এবং আমাদের উচ্চ খান্দানের দুর্নাম রটাতে চায় সমাজে।

সে তো দুদিন আগে ক্রীতদাসকে ধরে এনে আপন সন্তান বলে দাবি করে বসেছে। সে পাগল, উন্মাদ। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে সাথে সাথে তাকে দিয়ে দেয়। এটা তো পাগলামি। আবার চোর-বাটপার, নিম্ন বংশের লোকদের ডেকে ডেকে খাবার খাওয়ায়।

যখনই তোমরা দেখবে—দশ-বারোজন লোক তার দরজায় জড়ো হয়েছে, খেয়াল করবে, ঘরের ভিতর থেকে তারা ছোটখাটো জিনিস সরিয়ে ফেলছে। এদের মতো লোকদের সমাদর করা তো পাগলামি। হিশামের বংশের আমার এই ভাতিজা উন্মাদ হয়ে গেছে। পুরোপুরিই উন্মাদ...।"

আবু লাহাব কথা বলে যাচ্ছিল আর এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল। এই আশায় যে জটিল সমস্যাটির সমাধানকল্পে হয়তো কেউ তাকে সাহায্য করবে। সাদাসিধা কোনো বিষয় তো নয়। নবুয়তের দাবি... কি বিশাল ব্যাপার! শেষমেশ আবু সুফিয়ানের মুখাপেক্ষী হলো : "তুমিই বলো আবু সুফিয়ান! মুহাম্মদ তো একজন শক্ত-সমর্থ, সুদর্শন যুবক, মাথার একটি চুলও যার সফেদ হয়ে ওঠেনি। উচ্চবংশের সন্তান। সে আমোদ-প্রমোদ যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে। কিন্তু সে করছেটা কী? ঘরে আরামের বিছানা ফেলে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে শীতের প্রকোপে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তার মনের মধ্যে বসে গিয়েছে এক অন্ধ ধারণা। ফেরেশতা নাকি তার সাথে কথা বলে। ফেরেশতাই এখন তার অন্তরের ব্যাধি হয়ে গেছে।"

ক্লান্ত হয়ে অবশেষে আবু লাহাব বসে পড়ল। তার বন্ধু পেরেশান লজ্জিত। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। গোত্রে কোনো উন্মাদের আবির্ভাব হলে যেভাবে সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। কারো কোনো ক্ষমতা নেই কিছু করার। কারো মাথায় আসছে না কোনো পরামর্শ। এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কোনো পথ নেই...

বসতে বসতে আবু লাহাব ফের মুখ খুলল : "এক বছর আগের কথা মনে আছে? সবাই তার বন্ধু ছিল। মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখেছিল সবাই তাকে। কারো সাহস ছিল না তার বিরুদ্ধে কথা বলার। তোমাদের মাঝে সে বিভিন্ন কঠিন বিষয়ের ফয়সালা করে দিত। মিটিয়ে দিত পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ। প্রায়ই মানুষ তার কাছে যেত। ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক জ্ঞান করত তাকে। মিটমাট করে নিয়ে আসত সকল সমস্যা। মাত্র একটি বছর আগেও!"

আবু লাহাব কথা শেষ করে নিজের ক্রীতদাসকে ইশারায় ডাকল। তার যা বলার ছিল, সব উগরে দিয়েছে।

আমি এর পূর্বে আবু লাহাবকে কয়েকবার মাত্র দেখেছিলাম। কখনো কখনো মনে হতো, বেহেশত যেন তার থেকে এক কদম দূরত্বে। কদম উঠাবে আর জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ধারণাটা আমার মারাত্মক ভুল ছিল।

আবু জেহেল একমনে কী যেন ভেবে যাচ্ছিল। হয়তো সে দিতে চাচ্ছিল গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত : "মুহাম্মদ আমাদের উপাস্যদের ব্যাপারে যেসব উলটাপালটা কথা বলে—এ ব্যাপারে আমার কোনো কথা নেই। দুদিন পর উপাস্যরাই এর শোধ নিয়ে নেবে। আমার ভাবনা হলো—সাধারণ লোকদেরকে সে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এজন্য প্রথম পদক্ষেপেই ওর আশপাশের সঙ্গী-সাথিদের শায়েস্তা করতে হবে...।"

ব্যথার সাথি

আম্মারকে বেঁধে আনা হলো। আমি দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তাকে তারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে মাথা ঘুরিয়ে সে তাদেরকে বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগল। আমি মনে মনে বললাম—এখন হয়তো খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। ক্রীতদাস আবার মাথা তুলে তাকায় কীভাবে। মাথা নুইয়ে রাখাই তো তার জন্য নিরাপদ।

কিন্তু আম্মার আমাদের মতো গোলাম ছিল না। বরং বড় হওয়ার পর তাকে গোলাম বানানো হয়েছে। সে যদি আমার মতো জন্মগত গোলাম হতো, তাহলে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেতো না কখনোই মালিকদের দিকে। মনে হচ্ছিল সে আপন অধিকারের জন্য লড়াই করছে। পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষের মতো সে মুখোমুখি এগিয়ে আসছে।

"মুহাম্মদ তোদের কী কী শেখায়?" জিজ্ঞেস করল আবু সুফিয়ান।

"তিনি আমাদের শিক্ষা দেন—আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। চোয়ালের দন্তপাটির মতোই তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।"

দেয়ালের সাথে কান লাগিয়ে শুনছিলাম তার কথাগুলো। বাতাসের সাথে এই শব্দগুলো কানে স্পর্শ করার সাথে সাথেই আমার সর্বসত্তা কেঁপে উঠল। ভিতরে বয়ে গেল যেন শীতল সমীরণ। ওদিকে উমাইয়ার চেহারা আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

গোলাম আর মালিকের শ্বাস-প্রশ্বাস কখনোই এক হয় না...

আজও বুঝে আসেনি আমার, হঠাৎ করে আম্মার সেদিন এতটা ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল কেন? আল্লাহর বান্দা, তাদের সামনে এতটা বাহাদুরি দেখাবার কী প্রয়োজনই-বা ছিল?

সহজেই তো তুমি বলতে পারতে, মুহাম্মদ আমাদেরকে এক উপাস্যের আরাধনার শিক্ষা দেয়। দীক্ষা দেয় সত্য বলার। উপদেশ দেয় মানবতার। এসব বললে তো তোমাকে সহজেই ছেড়ে দিত। কিন্তু তুমি যা বললে, তা মেনে নিলে তাদের স্বায়ত্তশাসিত সমগ্র সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ক্রীতদাস ও মনিবের মাঝে সমতা? তাদের কাছে স্বপ্নেও অসম্ভব। আম্মারের কণ্ঠে আবার শোনা গেল আওয়াজ : "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দেন যে—এক আল্লাহর ইবাদত কর।"

অন্যান্য মনিবের চেয়ে আবু সুফিয়ানকে আমরা মনে করতাম, কিছুটা পুণ্যের পথে আছেন। ক্রীতদাসদের ঘরানায় তার একটা প্রসিদ্ধি ও শ্রদ্ধা ছিল। তার

নিজস্ব গোলামও মনিব হিসেবে তাকে ভালো জানত। প্রশংসাও করত বেশ। ইঙ্গিতে যেখানে কাজ চলত, সেখানে শব্দ অপচয় তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তার এই অস্বাভাবিক শীতলতা ও নীরবতা কখনো আমার কাছে মনে হতো উপহাস। তাই এমনটা দেখলে ভয় পেয়ে যেতাম।

আম্মারের ঘটনায় এর পুনরাবৃত্তি দেখলাম। সম্ভবত সে আবু সুফিয়ানের নীরবতা দেখে ধোঁকা খেয়ে গেল। আর বলে চলতে লাগল একের পর এক।

"এক উপাস্য!?"—আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে তখন ক্রোধের ঝাঁঝ কম ছিল। বলতে গেলে বেশি ছিল অনুসন্ধিৎসা ভেজানো সুর। "তা কী করে হয়? আমাদের তো তিনশ ষাট উপাস্য রয়েছে। তারাই তো আমাদের ইচ্ছা কামনা, চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে দেন।"

স্পষ্ট মনে করতে পারছি—সেই দিন সেই ঘটনার পর, মুহূর্তের মধ্যে আমার সারা জগৎ নতুনভাবে জন্ম লাভ করে নতুন এক জীবনের সন্ধান পায়।

"মুহাম্মদের তো জানা নেই আমরা যে মক্কায় খোদার ঘর বানাচ্ছি। এটার মাধ্যমে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। আলাদা আলাদা খোদা বিদ্যমান রয়েছে প্রত্যেক গোত্রের জন্য। এখানে প্রত্যেক বছর তারা আপন আপন খোদার পুজো দিতে আসে। এই মূর্তিরা তো আমাদের উপাস্য, সাথে সাথে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। তা ছাড়া কীভাবে আমরা গরিব, ফকির, মজদুরদের বঞ্চিত করতে পারি?" কথাগুলো বলতে বলতে আবু সুফিয়ান কেঁদে ফেলল। পুরোপুরি নাটকীয় ভঙ্গিতে, বড় বড় বাগ্মীরা কথায় প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য যেটা করে থাকেন।

"যদি আমরা তিনশ ষাট উপাস্যকে ছেড়ে এক উপাস্য মেনে নিই, যাকে দেখা যায় না, সব জায়গায় বিদ্যমান যার উপস্থিতি, এই বাগানে, তায়েফে, মদিনায়, জেরুজালেমে, চাঁদে, পৃথিবীতে তাহলে মানুষ পুণ্যের আশায় সেসব জায়গা ছেড়ে এত কষ্ট করে মক্কায় কেন আসতে যাবে? ঘরে ঘরেই যদি খোদা থাকে তাহলে মক্কায় আল্লাহর ঘরে কার আসতে এত ঠেকা পড়বে?"

এই বক্তৃতার পর সকলের চেহারায় তৃপ্ততার এক ঝলক দেখা গেল। এখানে হয়তো কথা শেষ হয়ে যেত। শাস্তি দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসত না। কিন্তু মনিব হঠাৎ করে ফাঁসিয়ে দিল আমাকে।

উমাইয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এখন মুখ খুলল। আমার পিছনে ছিল দেয়াল। উমাইয়ার মুখে আমার নাম শুনে আঁতকে গিয়ে একটু দূরে পড়ে গেলাম।

উমাইয়া নিজের রেশমি কাপড় দুলিয়ে সামনে এগিয়ে আম্মারকে জিজ্ঞেস করল : "কী বললে তুমি! গোলাম তার মালিকের সমান!! আমার কুৎসিত কাল ক্রীতদাস বেলাল, আমার উপার্জিত পয়সায় কেনা গোলাম... আমার সমান!?"

এসব বোঝাপড়া থেকে আমি অনেকদূরে। মালিকের কথার পিঠে আমি আর কীই-বা বলতে পারি। আমি তো ক্রীতদাস। বাবাও অন্যের কেনা গোলাম। আমি তো কারো সমানই নই। উত্তমও নই। পৃথিবীতে অস্তিত্ব বলতে শুধুই আমার এক কৃষ্ণকায় দেহ। বাজুতে কিছু শক্তি, অন্যের জন্য হাড়-ভাঙা খাটুনিতে একদিন তা ফুড়িয়ে যাবে।

উমাইয়ার কণ্ঠে ক্রোধ ছিল। ছিল উষ্ণতার ঝাঁঝ। প্রশ্নটা শুধানোর পর হাতের আঙুলগুলো নতুন করে আম্মারের থুতনি ধরে ঝাঁকুনি দিল... উপহাসের চূড়ান্ত যাকে বলে। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলে নিশ্চিত আমার মুখে অনেক কষ্টে আটকে রাখা হাসি বেরিয়ে পড়ত।

প্রশ্নটা শুধানোর পর তার কোনো অপেক্ষা ছিল না বিপরীত পক্ষ থেকে উত্তরের। ছিল না প্রয়োজনও। এমন অনর্থক প্রশ্নের কীই-বা জবাব থাকে। তবু পরিণতির ভয় ঝেটে বিদেয় করে আম্মার প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বলল : "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর দরবারে সকল মানুষ সমান। সে যেই বংশ ও বর্ণেরই হোক না কেন।"

কথার পর কিছুক্ষণ নীরবতার চাদর আচ্ছন্ন করে ফেলল সবাইকে। সেটা দীর্ণ করল মনিবের মুখে আমার নাম, "বেলাল।"

তখন বুঝতে পারিনি, মুহূর্তের মধ্যে তার মুখে আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে, আমার জীর্ণ জীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হতে যাচ্ছিল। আকস্মিকভাবে আমার প্রাসঙ্গিকতা সেখানে জড়িয়ে যাবার দরুনেই জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি পদার্পণ করতে পেরেছি, এটা বুঝতে পারছি এখন।

ব্যস! একমাত্র আল্লাহই বলতে পারেন, সামনে কী হতে যাচ্ছে...

আওয়াজ শোনার সাথে সাথে আমি "আজ্ঞে মনিব" বলে ডাকে সাড়া দিলাম।

"বেলাল, ওকে বুঝিয়ে দাও ভালোভাবে, তোমার মতো গোলাম আর আমার মতো মক্কার এক সরদারের ফারাক কী? এটা ধরো। মেরে মেরে ওর চেহারা বিকৃত করে ফেল। তখন ও পেয়ে যাবে বড় বড় কথার জবাব।"

এটা বলে আমার হাতে চাবুক তুলে দিল উমাইয়া। দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ... এদিক-সেদিক সরার কোনো সুযোগ নেই। কত সহজ সংক্ষিপ্ত কথা। অথচ এর পেছনে অপেক্ষা করছে কত বড় নিষ্ঠুরতা ও জুলুম।

ধুলোতে মলিন মুখে পড়ে ছিল আম্মার। মাথা উঁচিয়ে শাস্তি নেবার জন্য আমার সামনে বারবার মুখ পেতে দিচ্ছিল।

কিন্তু এরপর কী হলো! আমি বলতে পারছি না। এখনো যদি আমি সেই মুহূর্তের কল্পনা করি, কানে ঘণ্টা বাজতে থাকে। এক করুণ স্তব্ধতা পেয়ে বসে আমাকে।

মনে হয় তখন নিজের অস্তিত্ব যেন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। অতটা মনে পড়ছে না আমার তখনকার চিত্র। শুধু চোখে ভেসে ওঠে অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে পড়া উমাইয়ার ক্রোধ-বিস্ফারিত চোখ। আবু সুফিয়ানের চেহারার একপাশ। অন্যদিকে সে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল।

আবু সুফিয়ানও শাস্তি দেওয়ার পক্ষে ছিল। কিন্তু সম্মান-মর্যাদা বলে কথা। ব্যক্তিত্ব রক্ষার্থে নিজে থেকে অতটা এগুতে পারছিল না।

আমার চোখের সামনেই ছিল আম্মার। আধো আধো চোখে প্রত্যয়ের জ্যোতি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে ছিল সে। তার চোখের পাতায় ছিল পবিত্রতা, নিস্পৃহ নির্ভরতা। শঙ্কাহীন।

আমি আপাদমস্তক ইচ্ছাহীন, তবু বাধ্য। মনকে বেঁধে নিয়েছিলাম, যত কষ্টই হোক শাস্তি আমাকে দিতেই হবে। কিন্তু...

গোলামির বন্ধন আমার আর কতটুকুই-বা অটুট! আম্মারের চোখে আমি এমন এক শক্তিমত্তা দেখতে পেলাম, যা উমাইয়ার দাসত্ব-শেকল থেকে আমায় বিমুক্ত করে, বানিয়ে দিল অন্য কারো গোলাম।

আমার হাত থেকে চাবুক মাটিতে পড়ে গেল...

অন্যদিকে তাকিয়ে নেতারা অপেক্ষা করছিল, চটাশ চটাশ চাবুকের আওয়াজের। কিন্তু মাটিতে পড়ে যাওয়ার মৃদু আওয়াজ তাদের ফিরে তাকাতে বাধ্য করল। আমার চেহারায় তাকিয়ে তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও বুঝে ফেলল কী ঘটে গিয়েছে। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এক নগণ্য গোলাম। এর চেয়ে বেশি আর কিছু নয়...

আমি যা করেছি, জেনে-বুঝেই করেছি। মৃদু মৃদু হস্তসঞ্চালনে আম্মার ধরতে চাচ্ছিল চাবুকটা। কোনোমতে ধরে আমার হাতে দ্বিতীয়বার তুলে দিল। অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বলতে চাচ্ছিল সে। সেই অস্পষ্ট ধ্বনি আমার বুকে চিৎকারের মতো বেজে উঠছিল : "বেলাল, তোমাকে যেটা করতে বলল, করো। নাহলে তোমাকে ওরা মারবে।"

কিন্তু এবারও আমি ফেলে দিলাম, ঘৃণাভরে। বুকের মাঝে অনুভব করছিলাম, নূরের ফল্গুধারা নেমে এসে আমাকে শক্তিমান করে তুলছে।

আবু সুফিয়ান ভ্রুকুটি কেটে উমাইয়াকে ইশারা দিল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল হিন্দা। হিন্দাকে অনেক আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু তার দিকে তাকানোর দুঃসাহস হয়নি কখনো। স্পষ্টভাবে তার চেহারাও মনে করতে পারি না। মাঝেমধ্যে কয়েক ঝলক মনে পড়ে। কিন্তু সেদিন আমার বুকে কী সাহস এসেছিল, জানি না। আপাদমস্তক দেখে নিলাম তার মতো কঠোর ব্যক্তিকে।

রাগে ফুলে লাল হয়ে উঠেছিল উমাইয়ার চেহারা। অস্বাভাবিক রকম চুপ মেরে গিয়েছিল হঠাৎ করে। নীরবতা ভেঙে একসময় আমার চোখে চোখ রেখে বলল :

"বেলাল, তোর কি মনে হয়, তুই কোনো মানুষ? যদি মনে করিস, ভিন্ন কোনো খোদার উপাসনা করার অধিকার আছে তোর... তাহলে কান খুলে শুনে রাখ! তোর মনিবের খোদা যে, সেই তোর খোদা। আমার গোলামখানায় কোনো নতুন খোদার আমদানি বরদাশত করা হবে না।"

এরপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তোকে শায়েস্তা করতে হবে। কিন্তু আজ নয়। সূর্য মধ্যগগন থেকে যখন আগুনের ফুলকি ছড়াবে মরুর বুকে, সে সময়ের অপেক্ষা করছি। আজ সূর্যটা একটু হেলে পড়েছে।"

বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ কোত্থেকে আসা এক ইশারায় আমার হাত, পা, গর্দান শেকলাবদ্ধ হয়ে গেল। আমার উপর আকস্মিক আসতে লাগল কিল-ঘুষি-থাপ্পড়। আমি আজীবনের গোলাম। কারো বিরুদ্ধে নাফরমানি করার চিন্তাও মাথায় আসেনি কোনোদিন। কিন্তু বন্ধনে আটকে যাবার পর যেন আমি আগের চেয়ে আরো বেশি অনুগত হয়ে গেলাম। যতই শাস্তি আসুক, টু শব্দটি পর্যন্ত আমার ঠোঁট পেরিয়ে বাইরে আসেনি।

লাথি-গুঁতো দিয়ে আমাকে বের করে দেওয়া হলঘরের বাইরে। গোলামখানার খড়-পাতার মেঝেতে ধুলোবালির উপর আমি ব্যথায় কাঁতরাতে লাগলাম। উমাইয়া রইল সামনের দিনের মধ্যদুপুরের সূর্যতাপের আগুন ছড়ানোর অপেক্ষায়...

দাসত্বের কালো দাগ

জীবনের ষাট বছর বয়সের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি আজ। দাসত্বে নিঃশেষ হয়ে গেছে আটাশ বছর। পরবর্তী বাইশ বছর কেটেছে পরম স্বাধীনতায়। এখন বয়ে যাচ্ছে স্মৃতির পাতা আওড়াতে আওড়াতেই।

বনি জাহম গোত্রের গোলাম হিসেবে যখন ছিলাম, মনে হতো মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দু শ্রেণির। এক, যাদের ইচ্ছাধিকার আছে। আছে অনুভূতি ও স্বপ্ন দেখার অবকাশ। দুই, একমাত্র দেহ দিয়েই যাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় অবাঞ্ছিতদের দলেই নিজেকে দেখতাম।

আমি আর কি! আমার মতো যত গোলাম আছে, সবাই বুঝত... তার অস্তিত্ব বলতে জগৎ কেবল তার দেহটাই চেনে। দেহের শক্তির তারতম্যের কথা আলোচনা হয়। মানুষের বাজারে চলে আমাদের শক্তির রমরমা ব্যবসা।

একটা পশুর চেয়েও জঘন্য যান্ত্রিক জীব হিসেবে আমাদের গণ্য করা হতো। ক্রোধ ঝাড়া, চাবুক মারা, মানবেতর কাজে ব্যবহার করার জন্য আমাদের দেহ ছিল ওয়াকফকৃত।

দেহের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা ছাড়া আমাদের বিষয়ে আর কোনো কথা আদৌ বলা হয়েছে কি না... মনে পড়ে না।

আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগত মাঝেমধ্যে। এক নির্বাক ঝড়ে হৃদয়-পাথারে তরঙ্গ উথাল পাতাল করত। স্বাধীনতার আলো দু'চোখ ভরে দেখার স্বপ্ন দেখতাম আমরাও ক্ষণিকের জন্য। 'আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর' বুঝে তাৎক্ষণিক ফিরে আসতাম আমাদের মরুউষ্ণ বাস্তবতায়।

সামাজিক কুসংস্কারের বাধ্যবাধকতা আমাদের সামনে অটল পাহাড়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একে অপসারণ করার পথে এক পা এগুলে পরের পদক্ষেপে অপেক্ষা করছে মৃত্যু।

কিন্তু এই সামাজিক কুসংস্কারের বাধ্যবাধকতা কী ছিল?... ছিল বর্বর জাহেলিয়াত সংস্কৃতি, সারা আরবে যা ছিল উত্থানের পথে।

মানুষ ভুলে গিয়েছিল কল্যাণ ও উন্নতির পথ। তাদের জীবনের দৈনন্দিন খাতায় লেখা ছিল... অত্যাচার, অহংকার, মদ্যপায়িতা, জুয়া। সভ্যতার অর্থ উঠে গিয়েছিল তাদের অভিধান থেকে। প্রবৃত্তির বিষাক্ত ছোবলে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল নিঃস্ব নৈতিকতা। মানুষ যাপন করছিল বন্য জীবন। এই বন্যতা থেকে কোনো দুর্বলই রক্ষে পায়নি। এর মধ্যে ছিলাম আমরা... গোলাম শ্রেণি।

রক্তে রক্তে মিশে যেত এই গোলামির বন্ধন। খাঁচার পাখির মতো বন্দি থাকতে হতো। বাইরের জগতের আলো আসার কোনো দুয়ার ছিল না। কোনো ছিদ্র ছিল না আওয়াজ বাইরে যাবার মতো। মনিব বদলাত; কিন্তু ব্যবহার বদলাত না। কিছুদিন পর পর নতুন মনিবের যাঁতাকলে আমরা পিষ্ট হতে থাকতাম।

একের পর এক নিদারুণ অমানবিক জুলুমের থাবায় বিপর্যস্ত হয়ে যেতাম আমরা। এর প্রতিবাদ করার ভাষা ছিল না আমাদের। আমাদের মূল্যহীন চিৎকার শোনার জন্য অবকাশ ছিল না কোনো কর্ণের।

আমাদের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীর বুকে কোনো ধর্ম এগিয়ে আসেনি। প্রাচীন ধর্ম বিকৃতি আর অপব্যাখ্যার কবলে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল কুসংস্কারের ধূলিস্তূপে। ধর্মীয় পুরোহিত ও যাজকেরা একেকটা সুদি কারবার খুলে বসে ছিল সময়ের শক্তিশালী লোকদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। তাদের বিকৃতির দরুন ঐশী ধর্মগুলোর খোদাপ্রদত্ত অস্তিত্ব মুছে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে। মানুষের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা—উচ্চতা থেকে ক্রমশ গড়িয়ে পড়ছিল নিচের দিকে।

হেদায়েতের আলোর ঝলক উদ্ভাসিত করে তোলেনি মানবসভ্যতাকে। ইয়েমেন, সাবা, আদনের প্রাচীন মুছে যাওয়া সাম্রাজ্যের ছায়ায় নতুনভাবে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাতে মানবতার জন্য বিন্দুমাত্র আকুতি ছিল না। মক্কার প্রধান গোত্র কোরাইশ যাপন করছিল শিরক ও মূর্তিপূজার জীবন। আল্লাহর ঘর কাবা শরিফের পাশে জমিয়ে তুলেছিল জমজমাট ব্যবসা। তায়েফ ও মক্কার মহাজনরা সুদের কালো জাল বিছিয়ে দিয়েছিল সমাজের সর্বত্র।

লেখাপড়া জানা কিছু লোক যে ছিল না, তা নয়। প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাদের মোটামুটি জানাশোনাও ছিল। কিন্তু ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিবেচিত হতে থাকে তারা জ্ঞানপাপী। নিজেদের আখের গোছানোর জন্য মন-মতলব অনুযায়ী মানুষকে তারা ধর্ম শেখাত।

চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল প্রকট অন্ধকার। মানবসভ্যতার আঙিনায় নেমে আসেনি তখনো হেদায়েতের আলোকচ্ছটা...

এই সময়ে এসে আজ আমি তখনকার সামগ্রিক অন্ধত্ব অনুধাবন করতে পারছি। কিন্তু সে সময় আমার এতকিছু বোঝার অথবা দেখার পরিস্থিতি ছিল না। কোনো-না-কোনোভাবে সেই জাহেলি সমাজের সাথে আমরা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলাম বেঁচে থাকার তাগিদে।

তখন হঠাৎ করে মক্কায় একটা ঘটনা ঘটে গেল। ফলে বদলে যেতে থাকল শহরের চিত্র ও প্রেক্ষাপট। এক তুফানের মতোই শহরের উপর নেমে এল ঘন বর্ষণ। ঝরতে থাকল দিনের পর দিন। বদলে গেল মানুষের কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয়। চিন্তায় পড়ে গেল সমগ্র নগরী।

বিভিন্ন শ্রেণিতে এর প্রতিক্রিয়া ছিল বিভিন্ন রকম। কেউ কেউ এটাকে নিজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি ভাবতে লাগল। কেউবা একে আখ্যায়িত করল সামাজিক সংকট বলে। সাময়িক একটা তুচ্ছ ঘটনাও ভাবতে লাগল কেউ কেউ। গুরুত্বহীন বিষয় ভেবে চিন্তার সীমানার বাইরে রাখল এটাকে।

কিন্তু সবাইকেই কেন যেন কিছুটা ভাবিত চিন্তিত মনে হচ্ছিল। যেকোনো দুজন লোক পারস্পরিক কথাবার্তা বললেই এ প্রসঙ্গটি উঠে আসত...

"মুহাম্মদ নাকি নবুয়ত দাবি করে বসেছে। সে নাকি এক উপাস্যের দীক্ষা দেয় মানুষকে। সমতার দাবি জানায় সকল মানুষের মাঝে।"

মুহাম্মদকে আমরা সকলেই জানতাম, কম হোক বা বেশি। পুরো শহরে তার ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নৈতিকতা ও পুণ্য কাজের সুপ্রসিদ্ধি ছিল।

কিন্তু তার ঐশীবাণী, নবুয়তের দাবি, হেরাগুহায় ফেরেশতাদের সাথে কথোপকথন, একক উপাস্যের ধারণা, সমতার পাঠ, দরিদ্রদের অধিকার আদায়, পরজগৎ—এই বিষয়গুলো কোথায় গিয়ে থামবে? এই একের পর এক তুফানের বিক্ষুব্ধতা জ্ঞানসম্পন্ন সকল মানুষকেই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। এ বিষয়ে যেন-বা অনুধাবন করতে পারছিল সবাই, একে থামানো না গেলে নিজেদের সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সামাজিক দিক থেকে আমরা ছিলাম নিছক গোলাম; ধনদৌলতহীন, অধিকারহীন। আমাদের এতটা বিলাসিতা ছিল না যে আমরাও এ নিয়ে ভেবে দেখব।

আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম বেলাল আমি। সামাজিক মানুষ হিসেবে ছিলাম দ্বিতীয় স্তরের। তবু আমার চিন্তায় বিদ্ধ হয়ে গেল পরিস্থিতির ভাবনা। কোনো পাপের অনুভূতি ছিল না মনের ভিতর। অশেষ শক্তিতে ভরে গিয়েছিল আমার অন্তর। এই নতুন উদিত সূর্যকর আমার জীবনে বুঝি আলোক এনে দেবে...

আমার চিন্তায় এত কিছু ছিল না। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম, সারাটা জীবন আমাকে ঘিরে আছে অশেষ অন্ধকার। এই অন্ধকারে এক ফোঁটা রশ্মি ফুটে উঠেছে। ভবিষ্যতে যা হবার হোক, বর্তমানের চেয়ে মন্দ হবে না... এই ভাবনার ঢের মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল আমাকে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কয়েকবার দেখেছিলাম। কোনোদিন কথা হয়নি সামনাসামনি।

প্রতিবছর মক্কায় একটা বার্ষিক মেলা হয় প্রায় বিশ দিনের। একে বলা হয় উকাজ মেলা। এই বিশাল মেলা শেষ হলেও দূরদূরান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীগণ মক্কার অলিগলিতে পসরা সাজিয়ে সাধারণত আরো কিছুদিন অবস্থান করে থাকে। এসব আমার জানা ছিল না।

এ সময় মনিবেরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আড্ডা মারেন বিদেশি বন্ধুদের সাথে। আমরাও একটু ফুরসত পেয়ে এদিক-ওদিক ছুট দিই। অলিগলিতে কারো দিকেই চোখ পড়ছিল না। দুচোখ শুধু খুঁজে ফিরছিল সেই মহান পুরুষকে।

কয়েকবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে দিয়ে চলে গেলেন। প্রাণভরে দেখলাম তাকে প্রেমের দৃষ্টিতে। এই সেই মহান পুরুষ, যিনি এক আল্লাহর কথা বলেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আমার খুব ভালো লাগত। অনেক ভালো লাগত নিজের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে যখন দেখতাম তাকে। এই ভালোলাগা ছিল নিখাদ।

সমাজের প্রথম সারির মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু আমার মনে হতো অন্যদের মতো তিনি আমাকে নিম্নস্তরের মানুষ মনে করেন না। তার সাথে আমার কোনো দাসত্বের সম্পর্ক ছিল না। থাকার কথাও নয়। তবু আমি যেন অনুভব করতাম, তিনি আমাকে দেখে স্নেহের মুচকি হাসি দেন। আমার সমগ্র জীবনের একমাত্র পুলক ছিল শুধু... এবং শুধু তার ছোট্ট একটি হাসি। এর সাথে আমার জীবন বাঁধা পড়ে গিয়েছিল।

তিনি ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ আমার দিকে তাকিয়ে স্নেহের দৃষ্টিতে একটিবার হাসেনি। তার হাসি দেখে মনে হতো তার চেহারা ও চোখেই হাসি সীমাবদ্ধ নয়। তার সারা সত্তা যেন স্নেহের হাসিতে প্লাবিত হচ্ছে...

আমি হেসে ওঠা সকাল দেখেছি। দেখেছি রাতের আকাশে ঝলমলে তারকাদের। অবলোকন করেছি ফুলের হাসি। কিন্তু এসবের হাসি ছিল সীমাবদ্ধ, অনুভূতিশীল কিছু মানুষের জন্য।

কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি শিহরিত করে দিত আমাকে হাজার যন্ত্রণার মাঝেও। মন খুঁজে পেত এক আঁজলা জমজমের শীতল অমৃত। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলে মনে হতো, যেন আকাশ থেকে বৃষ্টির সাথে রুপো ঝরছে। তীব্র রোদের মাঝে মরূদ্যানের ছায়ায় যেভাবে বাবলা ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ফুটে ওঠে, সেভাবেই আমার পথিক-হৃদয়ের ক্লান্তির ছায়া হয়ে তার হাসি ফুটে উঠত।

এক কালো বর্ণের গোলাপের দিকে সুদৃষ্টি দেওয়া, তেমন কোনো গুরুত্বের কী আর? কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার দিকে তাকাতেন, মনে হতো এভাবে মুচকি হেসে তাকানোই যেন তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

তখন বুঝতে পারিনি। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, প্রতিটি কাজ অত্যন্ত গভীরতা ও মনোযোগ সহকারে আঞ্জাম দেওয়া, তার একটি অভ্যাস ছিল।

তার মুচকি হাসির মধ্যে কোনো ভনিতার ছাপ ছিল না। হাসির মধ্যে লুকিয়ে ছিল নিখাদ সত্য। এজন্য তার সকল কথাই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম।

নিজের মনে নিজে বলছিলাম, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ এক তাহলে বুঝে নিয়ো নিশ্চয়ই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি যদি বলে থাকেন তিনি আল্লাহর রাসুল, তাহলে সত্যিই তিনি আল্লাহর রাসুল। ফেরেশতার সাথে তার নিয়মিত কথা হয়, এমন দাবিও যদি তিনি করে থাকেন, আপন দাবিতে তিনি সত্যবাদী।

আমার অবচেতন মনেই বোঝাপড়া চলছিল এসব চিন্তাভাবনার। বাস্তব চেতনে এই কথাগুলো তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, যখন এক রাতে উমাইয়া গোলামখানায় এসে সরাসরি আমাকে শুধালেন :

"সত্যি করে বল, কে তোর খোদা?"

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদাই আমার খোদা।"

উত্তর শুনতেই উমাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। কিন্তু এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল সে। ফের বলল :

"এর অর্থ দাঁড়ায়, তুই আমাদের খোদাদের অস্বীকার করিস।"

"মুহাম্মদ তো বিশ্বস্ত। তাকে এক মহান ফেরেশতা জানিয়েছেন, আল্লাহ শুধুই একজন।"

মনে মনে আমি ভাবতে লাগলাম। গতকাল আম্মারের যেই কথায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না, আজ সেই কথাই আমার মুখ থেকে নির্গত হলো। আম্মারের আচরণে গতকাল আমি ছিলাম শংকিত, কিন্তু নিজের হুবহু আচরণে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হচ্ছে না।

এই অত্যাচারী মনিবের জুলুমের তীব্র মাত্রা সম্পর্কে যে আমার ধারণা ছিল না তা কিন্তু নয়। তবু ভিতরে ভিতরে আমি অনুভব করছিলাম এক তরঙ্গায়িত শক্তির ঢল। এর সামনে উমাইয়ার মতো পার্থিব বাধা-বিপত্তি ভেসে যাচ্ছিল খরকুটোর মতো।

"তোকে আমি মেরে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব" প্রলাপ বকতে বকতে গোলামখানার বাইরে চলে গেল উমাইয়া। তাকে তখন আমার নিতান্তই এক অসহায় শিশু মনে হচ্ছিল, যার কোনো খেলনা ভেঙে গেছে...

এরপর থেকে প্রতিদিন আমাকে ঘরের বাইরে এনে তপ্ত বালুতে শুইয়ে বুকে পিঠে অগ্নিবৎ পাথরের চাপ দেওয়া হতো। চাবুক মেরে রক্তজর্জরিত করা হতো আমাকে। উমাইয়া এই কঠিন শাস্তির মুখে চেষ্টা চালাত আমাকে মাটির বানানো উপাস্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানোর।

এই শাস্তির কারণে আমার কোমরে খুব গভীর জখম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত সেখান থেকে রক্ত ঝরত।

আমি কখনোই স্বীকার করিনি তাদের মূর্তিগুলোকে। তাই উমাইয়াও দিনে দিনে বাড়িয়ে দিতে থাকল তার জুলুমের মাত্রা। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন শাস্তি সামনে আসতে থাকে।

প্রতিদিনই আমি প্রায় পৌঁছে যেতাম মৃত্যুর কাছাকাছি। অজ্ঞানপ্রায় অবস্থায় আমি কেবলই উচ্চারণ করে যেতাম "আহাদ! আহাদ! আল্লাহ এক! আল্লাহ এক!"

একদিনের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। রাত ও দিনে আমাকে কোনো খাদ্যই দেওয়া হলো না। জঠরে ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এর মধ্যে আমাকে তপ্ত বালুকায় ফেলে চাবুক পেটাতে লাগল উমাইয়া। ফাঁকে ফাঁকে চলছিল স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা। চৈতন্যহীন অবস্থায়ও আমি উচ্চারণ করে চলছিলাম আমার প্রিয় শব্দ আহাদ আহাদ...

বনু জুমাহ গোত্রের সবাই জানত আমাকে ধর্মান্তরের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়...

পরবর্তীতে একসময় আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছিলেন, তিনিও নাকি আমার শাস্তি দেখতেন...

বাচ্চারাও আমার নাম জানত...

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু জুমাহের গলিতেই থাকতেন। প্রায়ই তিনি আমাকে দেখতেন। হতাশ মনে নিচ দিকে তাকিয়ে আবার চলে যেতেন।

তপ্ত বালুর উষ্ণতা আর চাবুকের শাস্তি যখন ফেরাতে পারল না আমাকে, উমাইয়া তখন উপায় না দেখে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

হাত-পা-গলায় বেড়ী পরিয়ে ছেড়ে দিল বনু জুমাহের বালকদের হাতে। নৃশংস বালকেরা চিল্লাচিল্লি-চেঁচামেচি করে আমাকে টানা-হেঁচড়া করে হাতের পুতুল বানিয়ে নিল। তাদের চিৎকার ও হৈ-হুল্লোড়ে আমার অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি মিলিয়ে যেত অর্থহীনতার হাওয়ায়।

কর্মহীন বালকদের যেন একটা মহানন্দের কাজ হাতে এসে গেছে। যে যতটা আনন্দ লুটতে পারো, নিয়ে নাও। আমার গলার বেড়ী ধরে তারা টান দিত সজোরে। আমিও পড়ে যেতাম। কাতরাতাম ব্যথায়।

যখন কষ্ট করে ওঠার চেষ্টা করতাম, আবার টান দিয়ে ফেলে দিত তারা। ফেটে পড়ত তারা তুমুল অট্টহাসিতে। কখনো কখনো আমার গলায় এত শক্তভাবে রশি পেঁচিয়ে দিত, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো।

তাদের অবিরাম টানা-হেঁচড়ায় শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তের জখমে ভরে যেত। আগের ব্যথা সারতে সারতে নতুন আঘাতে হয়ে যেতাম বিপর্যস্ত। রক্তে রক্তে জমাট বেঁধে বিশ্রীরকম কালো হয়ে যেত আমার কাল দেহটা।

দ্বিপ্রহরের পর মক্কার পাথুরে বালি-ভূমি থেকে যখন আগুনের ভাপ উঠত, বাচ্চা-কাচ্চারা আমার দেহের পোশাক টেনে খুলে ফেলত।

উবাইদা বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো কখনো আমার পিছনে এসে দাঁড়াতেন। ব্যথিত হৃদয়ে অবলোকন করতেন আমার দেহের রক্তাক্ত জখম। মমতায় নুয়ে পড়ত তার মন।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই, সেই রক্তাক্ত দাগগুলো থেকে কত ফুল ফুটে উঠেছে! আলোর ফুলকিতে নেচে উঠেছে কত সূর্যকর!

পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়লে আমার হাত-পা বেঁধে ফের গোলামখানায় ফেলে রাখা হতো। সারা দেহ জখমে জর্জরিত। বরং বলা ভালো দেহই হয়ে উঠত জখমের একটি অংশ। প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হতে থাকত।

বনু জুমাহ গোত্র থেকে হাসসান বিন সাবিত একবার এসেছিলেন জুলুমের তামাশা দেখতে। তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই কোনো প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হয়নি তার মুখ থেকে।

কিন্তু দুর্বল একজন পুণ্যবান মানুষের কথা মনে পড়ে। কখনোই ভুলতে পারব না তাকে... ওয়ারাকা বিন নওফেল।

অগ্নিদগ্ধ গরম তেলে চুবানো চাবুক দিয়ে পিটিয়ে চামড়া পুড়িয়ে ফেলছিল উমাইয়া। ঠিক তখনই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ওয়ারাকা বিন নওফেল। উমাইয়া যখন আমাকে মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল, আমি তখন শুধু বলে যাচ্ছিলাম, আহাদ! আহাদ!

আওয়াজ শুনে থেমে গেলেন ওয়ারাকা বিন নওফেল। বললেন, "বেলালের কথাই সত্যি"। উমাইয়াকে লক্ষ করে আরো বললেন : "আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, তুমি যদি বেলালকে মারতে মারতে একদম মেরেই ফেলো, তাহলে তার কবরের উপর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি মাজার স্থাপন করব।"

কিন্তু এই বৃদ্ধের কথা কানে তোলার প্রয়োজন বোধ করল না উমাইয়া...

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের তীব্রতায় আমাকে নিয়ে নৃশংস বালকেরা যখন টানা-হেঁচড়া করত, একপর্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হতো উমাইয়া। বলত : "এখনো মুহাম্মদের আল্লাহ থেকে সরে এসেছিস নাকি আসিসনি?"

আমার কোনো উত্তর ছিল না 'আহাদ আহাদ' ধ্বনি ব্যতীত। অন্য কোনো উচ্চারণ যেন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

নতুন নতুন শাস্তির মাত্রা বাড়িয়েও যখন বিন্দুমাত্র সরাতে পারল না আমাকে মুহাম্মদের পথ থেকে, তখন উমাইয়া চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল। বলল : "আজ বেলালের জীবনের শেষরাত। আগামীকাল সকালের আলো দেখার পরই তার চোখে নেমে আসবে অন্ধকার। ক্রমাগত নির্মম শাস্তি. তারপর মৃত্যুর সমাপ্তি।"